BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link :: https://doi.org/10.70798/Bijmrd/020600020

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 6| July 2024| e-ISSN: 2584-1890

জীবনানন্দের প্রেমচেতনা : আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন

Mitali Singha

Mail: mitalisingha27@gmail.com

Abstract: *আলোচ্য প্রবন্ধটিতে কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এক অনন্য প্রেমচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ এই কবি তাঁর সৃষ্টিতে প্রচলিত রোমান্টিক ধারণার বাইরে গিয়ে প্রেমকে এক নতুন মাত্রায় মূর্ত করেছেন। কবি প্রেমের ক্ষণস্থায়ী রূপ, বিচ্ছেদ, বেদনা, শারীরিকতা এবং মানসিক দ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েও প্রেমের চিরন্তন শক্তি ও মহত্ত্বের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে 'বনলতা সেন', 'শ্যামলী', 'সুচেতনা' বা 'সুরঞ্জনা'-র মতো নারী চরিত্রের মাধ্যমে তিনি প্রেমকে নাম, পদবী ও সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক পটভূমিতে যেমন বাস্তব রূপ দিয়েছেন, তেমনই ইতিহাস-চেতনা ও দূর অতীতের রহস্যময় সৌন্দর্যের মিশ্রণে তাকে এক শাশ্বত ও বিশ্বব্যাপ্ত রূপ দান করেছেন। রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত আধুনিক কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেননি, বরং রবীন্দ্রনাথের 'সবুজ স্বপ্ন' বা এডগার অ্যালান পোর 'টু হেলেন'-এর মতো বিশ্বসাহিত্যের ঐতিহ্যকে নিজের কবি-মানসে অঙ্গীভূত করে নতুন চিত্রকল্পের সার্থক রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। জীবনানন্দের প্রেমে কেবল ব্যক্তিগত না-পাওয়ার হাহাকার বা শূন্যতা নেই, বরং তা জীবনের সমস্ত ক্লান্তি ও 'রক্তের অসুখ' নিরাময়ের এক পরম 'শ্রেয়তর বেলাভূমি' ও সুশান্তির প্রতীক। পরিশেষে, তাঁর এই প্রেমচেতনা কোনো আধ্যাত্মিক বা নিছক অবয়বহীন ধারণা নয়; এটি এক অন্তহীন জীবনবোধ ও গভীর চেতনা, যা মানুষের ব্যক্তিগত গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বমানবতা ও সভ্যতার ক্রমমুক্তির পথ দেখায়।*

Keywords: *জীবনানন্দ দাশ, প্রেমচেতনা, আধুনিকতা ও ঐতিহ্য, চিত্রকল্প, ইতিহাস-চেতনা, ব্যক্তিগত ও উত্তরব্যক্তিক।*

Introduction: এই যে পৃথিবী আদিকাল থেকে শত সহস্র নদীর স্রোতধারায় বয়ে চলেছে নিরবধি তার প্রধান আকর্ষণ হলো প্রেম। প্রেম না থাকলে অর্থহীন পৃথিবীতে মানুষ কতকাল বেঁচে থাকতে সামর্থ হতো তা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়। আর ঠিক এ মহাজীবনের সূত্র ধরেই সাহিত্য রচনার একটি প্রধান উপজীব্য হলো প্রেম। তা সে মানুষের জন্য হোক আর প্রকৃতির জন্যই হোক। রোমান্টিক ধারার সাহিত্য হয় নারী-পুরুষের প্রেম নিয়ে। কবি কোনো মুখ কল্পনা করে কবিতা লিখে যান, গল্পকার গল্প লিখেন। মানব জীবনের নিত্য অনুভূতির নাম প্রেম। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে যার ডাক আসে। এই প্রেমানুভূতি নিয়ে দুই ধরনের সাহিত্য তৈরি হয়। পাওয়া বা না পাওয়ার অনুভূতি। তবে উল্লেখ্য, পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার অনুভূতিই বরং তীব্র হয়। আকাঙ্ক্ষা থাকে, বিরহ রসে পাঠক অশ্রুসিক্ত হয়। তবে সাহিত্য বা চলচ্চিত্রে বিরহ পাঠককে যেভাবে টেনেছে মিলন মনে হয় ততটা পারেনি। সেই শেক্সপিয়রের রোমিও-জুলিয়েট থেকে শুরু করে হালের বিরহগাথা গল্প, কবিতা বা উপন্যাস, সবক্ষেত্রেই একসূত্র। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। দুজনের বিচ্ছেদেই প্রেম যেন আরো স্বার্থক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া প্রেম তো কেবল কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়। তবে সবার প্রেম বা ভালোবাসাবোধ সমান নয়। কারো ভীষণ গভীর। বহু কবির বহু কবিতায়ই সৃষ্টি হয়েছে নারী চরিত্র। কবিতাপ্রেমীকে তা মুগ্ধ করেছে। যারা কবিতা ভালোবাসেন না তারাও সেই কবিতার চরিত্রকে উদাহরণ টেনে স্বপ্ন বোনেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রের কথা মনে হলে প্রথমেই মনে আসে 'নাটোরের বনলতা সেন'-এর কথা। যুগ যুগ ধরে যে বনলতা সেন বহু যুবকের উদাহরণ হয়েছে। যার স্রষ্টা কবি জীবনানন্দ

দাশ। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যে যার কবিতা সবথেকে বেশি সমাদৃত, অনুসৃত তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে প্রেম, নারী, রোমান্টিকতা, ভালোবাসা, দেশাত্ববোধ। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে বারবারই মৃত্যুর বিষয়টি উঠে এসেছে। উঠে এসেছে বারবার এই বাংলায় ফিরে আসার তুমূল আকুতি। কবিতায় ভালোবেসেছেন স্বদেশকে। প্রিয় জন্মভূমির টান ছিল তাঁর কলমে। ফিরে আসতে চেয়েছেন তাঁর প্রিয় ধানসিঁড়ি নদীর তীরে। এই বাংলার প্রকৃতিই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। মায়ায় নিজে জড়িয়েছেন, সেই সঙ্গে তাঁর পাঠকদেরকে টেনেছেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বলা হয়, রবীন্দ্র প্রভাববলয় থেকে মুক্ত করেছে তাঁর কবিতা। আধুনিক কবিতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। বিষণ্ন, স্বপ্নময়, আশ্চর্য শোভাময় কবিতার মধ্যে ক্লান্তি, হতাশা, বিষাদ সোনার টুকরোর মতন কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাঁর কবিতাকে বলেছিলেন চিত্ররূপময়। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে 'নির্জনতম কবি' আখ্যায়িত করে লিখেছেন- "এ কথা ঠিক যে তিনি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক" অথচ "ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো। ...তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য স্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল।"১

Discussion: জীবনানন্দ যেমন প্রকৃতির বেদনার আঘাতের ও হিংস্রতার দিকটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও প্রকৃতিলীন জীবনে আস্থা স্থাপন করেছেন, তেমন-ই প্রেমের আঘাত, বেদনা ও দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত থেকেও প্রেমের কাছে পীড়িত হৃদয়ে শুশ্রূষা ভিক্ষা করেছেন। প্রেম যে ক্ষণিক, এ-কথা আধুনিক কবি জানেন। নশ্বর প্রেমের বিচ্ছেদের যন্ত্রণাও তাঁর অজানা নয়। 'সব প্রেম প্রেম নয়' একথা তাঁকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, তবু প্রেমের শক্তিতে ও মহত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী। তাঁর কাছে প্রেমের দুর্বলতাও যেমন বাস্তব, প্রেমের শক্তিও তেমন-ই বাস্তব। জীবনানন্দের কাছে প্রেম 'শ্রেয়তর বেলাভূমি'। কবি জানেন, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর প্রেমিকা পৃথিবীতে অগাধ জীবনের মাঝখানে বেঁচে থাকবে, তবুও বলতে পারেন-

"আমার সকল গান তবুও তোমাকে লক্ষ্য করে!" [নির্জন স্বাক্ষর - ধূসর পাণ্ডুলিপি]

প্রেম যে স্থায়ী নয়, এ-অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন-

"তুমি শুধু একদিন, -এক রজনীর!" [সহজ- ধূসর পাণ্ডুলিপি]

তবু প্রেমের ক্ষণিকতার মধ্যেই যা পাবার তা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়-

"একদিন এসেছিলে,-
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত! [সহজ- ধূসর পাণ্ডুলিপি]

নারী তো হরিণীর মতো। মানব-সমাজই তাকে ছলনা শিখিয়েছে। প্রেমের ছলনায় পুরুষ মুগ্ধ হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোহ তার ভাঙে, মৃত্যুর অধিক ঘৃণা ও যন্ত্রণার অভিজ্ঞতায়। আধুনিক কবির কাছে প্রেম নিরাবয়ব নয়। শরীরের ভূমিকাকে তিনি যথাযোগ্য মূল্য দেন-

"তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিল একবার —" [১৩৩৩ - ধূসর পাণ্ডুলিপি]

অথবা,

"আজ শুধু দেহ আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর; – চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া, শুধু পীড়া। মুকুলে মুকুলে শুধু কীট, আঘাত, দংশন –
চায় আজ মন।" [পিপাসার গান - ধূসর পাণ্ডুলিপি]

প্রেমের রাজ্যে সন্দেহ, হিংসা বাস্তবিক বলেই কবির কাছে মানবিক-

"আমারে চাওনা তুমি আজ আর, জানি;
তোমার শরীর ছানি'
মিটায় পিপাসা
কে সে আজ! -তোমার রক্তের ভালবাসা
দিয়েছ কাহারে!" [পিপাসার গান - ধূসর পাণ্ডুলিপি]

প্রেমের মসৃণ মুখোশের আড়ালে কবি স্বার্থের কুটিল মুখ দেখতে পেয়েছেন। অঘ্রাণের রাতে হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক ছিঁড়ে চলে যায়, প্রেমও তেমনই কিছুক্ষণের জন্য হৃদয়কে বীণার মতো বাজিয়ে জীবনকে নির্মম হাতে ছিঁড়ে দিয়ে দূরে সরে যায় — একথা তিনি জানেন। তবু সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের চেয়ে প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি। পাখির মায়ের মতো প্রেম আমাদের বুকের ক্ষতকে ঢেকে রাখে, তাই বলতে পারেন-

"তার ছিঁড়ে গেছে;—তবু তাহারে বীণার মতো করে
বাজাই - যে প্রেম চলিয়া গেছে তারি হাত ধরে।" [প্রেম - ধূসর পাণ্ডুলিপি]

আমাদের রক্তের অসুখ প্রেম-ই সুস্থ করে দিতে পারে। পৃথিবীতে প্রেম আছে বলেই জীবন সুন্দর-

"জীবন আছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি হয়েছে বলে প্রেম,-
....
তুমি যদি বেঁচে থাক, জেগে রব আমি এই পৃথিবীর 'পর
যদিও বুকের পরে রবে মৃত্যু মৃত্যুর কবর!" [প্রেম - ধূসর পাণ্ডুলিপি]

প্রেমের মধ্যে বেদনা আছে বলেই বোধ হয় প্রেমকে ভুলে থাকা যায় না। সন্দেহ হয়, কাঁটার জন্যই বুঝিবা প্রেমের ফুলের দুর্নিবার আকর্ষণ। প্রেমের বিশুদ্ধ নির্যাস কোনদিন বাতাসে উবে যেত, যদি না কাঁটার বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রক্তাক্ত পরিচয় ঘটতো। প্রেম চলে গেলে বিচ্ছেদের মর্মান্তিক বেদনা যেমন স্বাভাবিক, তেমন-ই স্বাভাবিক হারানো দিনের ঐশ্বর্যময় অনুভূতির স্মৃতি রোমন্থন। এক প্রেম চলে যায়, অন্য প্রেম আসে, সে প্রেমও চলে যায়, স্বপ্ন বেঁচে থাকে-

"তুমি, সখি, ডুবে যাবে মুহূর্তের রোমহর্ষে – অনিবার অরুণের স্নানে
জানি আমি; প্রেম যে তবুও প্রেম : স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে রবে,
বাঁচিতে সে জানে।" [হৃদয়ে প্রেমের দিন - রূপসী বাংলা]

এ স্বপ্নই গোধূলিতে নদীর নরম মুখে হারানো প্রেমের কত রেখা খুঁজে পাবে, আর যে গেছে তার সঙ্গে কোনদিন দেখা হবার সম্ভাবনা নেই -একথা জেনেও মন তখন গেয়ে উঠবে-

"কি বা, হায়, আসে যায়, তারে যদি কোনদিন না পাই আবার।"
[এইসব ভাল লাগে - রূপসী বাংলা]

'বনলতা সেন' রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা। বুদ্ধদেব বসু যেমন প্রেমিকাকে নামের বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন (অমিতা, অপর্ণা, রমা), জীবনানন্দও তেমনই প্রেমকে মূর্ত করেছেন বনলতা, অরুণিমা শেফালিকা, মৃণালিনী ইত্যাদি পরিচিত নামের মধ্যে। নামের সঙ্গে পদবী যোগ করে (বনলতা সেন, অরুণিমা সান্যাল, শেফালিকা বোস, মৃণালিনী ঘোষাল) জীবনানন্দ তাঁর নায়িকাকে তারও বেশি বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলেছেন। সব শেষে ভৌগোলিক পরিবেশের মাঝখানে স্থাপিত করে (নাটোরের বনলতা সেন) নিবিড়ভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জীবনানন্দ নাম, পদবী ও ভৌগোলিক অবস্থিতির উল্লেখে নায়িকাকে যেমন ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন, তেমনই হাজার বছরের পটভূমিকায় তাকে বিস্তৃতি দিয়ে কম রহস্যময় করে দেখেন নি। প্রেমের মধ্যে দেহসর্বস্বতা

ক্লান্তিকর, আর বায়বীয় নিরাবয়বতা অতৃপ্তিকর। বনলতা সেনের মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষ এক বিন্দুতে এসে মিশে গেছে, কেউ কারো ক্ষতি করেনি, বরং একে অপরের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। অথচ তার জন্য কবিকে সবিশেষ আয়োজন করতে হয় নি। কত কম আয়োজনে কবি অপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন, ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়।

প্রথমেই নজরে পড়ে 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। জীবনের ক্লান্তিকে প্রকাশ করা জীবনানন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে- "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে" -এ স্বীকারোক্তি দিয়ে। এ হাজার বছরে আর কিছু প্রাপ্তি ঘটেছে কিনা জানি না, কিন্তু সব ছাপিয়ে অফুরন্ত ক্লান্তির কথাই আজ মনে পড়ে-

"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।"

[বনলতা সেন - বনলতা সেন]

-এ ক্লান্তি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের অথবা যুগের ক্লান্তি নয়, মানব-সমাজের হাজার হাজার বছরের ক্লান্তি; মানুষের জীবনে অস্তিত্ববোধের ক্লান্তি। এ ক্লান্তি থেকে কবি মুক্তি চান। জীবনানন্দের কাছে মুক্তির আশ্রয় তিনটি- প্রকৃতি, প্রেম ও অতীতের রহস্যময় সৌন্দর্যের জগৎ। 'বনলতা সেন'-এ এই তিনটি আশ্রয় মিলে কবির জন্য একটি নীড় রচনা করে দিয়েছে। বনলতা সেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কবি প্রকৃতির গভীর শান্তি অনুভব করেছেন। বনলতা সেন তাঁর কাছে সকল ক্লান্তির শেষে পরম শান্তির আশ্রয়; সে আশ্রয় দারুচিনি- দ্বীপ ও সবুজ ঘাসের দেশের প্রাণ-সৌরভ মেশানো-

"অতি দূর সমুদ্রের পর
হালভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সুবজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"

[বনলতা সেন - বনলতা সেন]

সারাদিন ধরে পাখি রৌদ্রদগ্ধ হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তার জন্যও একটি নীড় অপেক্ষা করে থাকে, সন্ধ্যায় ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে জোনাকি জ্বলা অন্ধকারে নীড়ের গভীর প্রশান্তির কাছে ধরা দেয়। বনলতা সেনের পাখির নীড়ের মতো চোখে কবি নিরালম্ব জীবনে আশ্রয় ক্লান্তিজর্জর হৃদয়ে প্রশান্তির আশ্বাস পেয়েছিলেন। পাখির নীড় বনের লতায় তৈরি, সেই সুদূর সূক্ষ্ম সাদৃশ্য নায়িকার নামে ধরা আছে-

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;" [বনলতা সেন - বনলতা সেন]

হাজার বছরের দূরের জগৎ থেকে কবি যে কেবল ক্লান্তি এনেছেন, তা হয়তো সত্য নয়; অতীতের দূর অন্ধকার বিদিশার নিশার ধূপের ধোঁয়ার সৌরভ নিয়ে এসেছেন, আর তাই দিয়ে বনলতা সেনের চুলগুলিকে সুরভিত করে তুলেছেন; এনেছেন শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্য নিয়ে বনলতা সেনের মুখখানা সাজিয়ে দিয়েছেন। এ সৌন্দর্য ও সৌরভ বহু দূরের বলেই তার সংঙ্গে সূক্ষ্ম রহস্যের অনুভূতি মেশানো। বলা বাহুল্য, প্রতিতুলনার মধ্যে অপ্রাপ্তির হাহাকারও ব্যঞ্জিত হয়েছে বলে এ রহস্যময় সৌন্দর্য ও সৌরভ করুণ বেদনায় রঙিন। বাস্তবে বনলতা সেনের কাছে কবি দু'দণ্ডের শান্তি পেয়েছিলেন ('আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন'), কেননা ক্ষণিকতাই প্রেমের ধর্ম; কিন্তু সেই দু'দণ্ডের শান্তিই স্মৃতি ও স্বপ্নের জগতে কালের পরিধি ছাড়িয়ে চিরদিনের হয়ে থাকলো। তখন বনলতা সেন যেন কোনো নারী নয়, সে প্রেমের প্রশান্তির প্রতীক-

"সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন

তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।" [বনলতা সেন - বনলতা সেন]

আজও জীবনে ক্লান্তির অভাব নেই, কিন্তু বনলতা সেন কবির অন্তরে প্রেমের যে নীড় রচনা করেছে, তা চিরসবুজ ও চিরসজীব, কোনো হেমন্তই তাকে ভেঙে ফেলতে অথবা কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে হিম-শীতল করতে পারে না। জীবনের লেনদেন চুকিয়ে দিয়ে কবির ক্লান্তিজর্জর হৃদয় সেখানে নিভৃতে বনলতা সেনের মুখোমুখি বসার অধিকার লাভ করে, প্রেমের স্মৃতি নকশাপাড় শাড়ির আঁচলে তাঁর জীবনের সকল ক্লান্তির চিহ্ন মুছে নেয়। 'বনলতা সেন'-এ ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হয়ে কবিতাটিকে বিস্ময়কর সংহতি দান করেছে। প্রথম স্তবকের 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'-এর চিত্রকল্পটি দ্বিতীয় স্তবকের দূর সমুদ্রে হালভাঙা দিশেহারা নাবিকের চোখের সামনে দারুচিনি-দ্বীপের ভেতর সবুজ ঘাসের দেশের চিত্রকল্পটির প্রেরণা জুগিয়েছে। আবার দ্বিতীয় স্তবকের পাখির নীড়ের চিত্রকল্পটি তৃতীয় স্তবকের সন্ধ্যায় ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে পাখির ঘরে ফিরে আসার চিত্রকল্প উদ্ভাবনে সাহায্য করেছে। বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ ও দূর অন্ধকারে বিদর্ভনগর পরিক্রমা বিদিশার নিশা ও শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বনলতা সেনের কোনো একটি চিত্রকল্পই বিচ্ছিন্ন নয়; তারা পরস্পর নির্ভর ও পরস্পর-প্রবিষ্ট।

"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।" [বনলতা সেন - বনলতা সেন]

-পংক্তি দু'টির অন্ত্যানুপ্রাস আমাদের হৃদয়ের নিভৃতে বীণার তারে একটি মৃদু ঝংকার তুলে দেয়। সেই ঝংকার থামে না, বরং-

"বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।" [বনলতা সেন - বনলতা সেন]

-এ পংক্তি দু'টির অভাবিতপূর্ব শেষ-মিলের আবেগঘন আলোড়নের সঙ্গে মিশে যায়, আর বনলতা সেনের বীণার ধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর আমাদের হৃদয়ের রক্ত চঞ্চল করে। সে আন্দোলন থামে একেবারে শেষের পংক্তি দু'টিতে এসে-

"সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।" [বনলতা সেন - বনলতা সেন]

তখন আর কোনো আলোড়ন নেই, আছে শুধু স্তব্ধতার ধ্বনি! আধুনিক কবির হাতে উপমা যে কী দৈবশক্তির মতো কাজ করে যায়, বনলতা সেনে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। বনলতা সেনের বিদিশার নিশার মতো অন্ধকার চুল, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো মুখ, আর পাখির নীড়ের মতো চোখ প্রেমের বিস্ময়, রহস্য, সুদূরতা ও প্রশান্তিকে মূর্ত করে তুলেছে।

কবিতাটি পড়তে পড়তে সিদ্ধির পেছনে যে-পরিশ্রম, তার কোনো ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না, আর সেখানেই কবির কৃতিত্ব। তাই আকারে ক্ষুদ্র হলেও 'বনলতা সেন' ইঙ্গিতে সুদূরপ্রসারী। জীবনানন্দ আধুনিক কবি। প্রেমের হতাশা; ক্ষণিকতা, ছলনা, সবকিছু তাঁর জানা। তবু প্রেম যে শাশ্বত, এ-কথা তিনি মানেন। প্রেম যতই ক্ষণকালের জন্য জীবনকে আশ্রয় দিক-না কেন, জীবনকে অন্যলোকে উত্তীর্ণ করার ক্ষমতা তার আছে, এ শাশ্বত অভিজ্ঞতাই জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় সমর্থিত হয়েছে। কাজেই রোমান্টিক কবিদের শাশ্বত প্রেমের আদর্শে জীবনানন্দের বিশ্বাস নেই -একথা আমরা মানতে পারি না। আসলে আধুনিক কবি প্রতিটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ অথবা পূর্বসূরিদের বিপরীত, এ-ধরনের ভ্রান্ত ধারণাই সমালোচককে বিপথে চালিত করে। 'বনলতা সেন' জীবনানন্দ দাসের সকল রকম বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়েও ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়, তাকে অঙ্গীভূত করেই 'বনলতা সেন' রবীন্দ্রোত্তর যুগের একটি মহৎ কবিতা। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ভূমিকার পটভূমিকায় বনলতা সেন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'বনলতা সেন' পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতাটি পাঠকের মনে পড়বে-

"দূরে বহুদূরে
স্বপ্নালোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে।" [স্বপ্ন - কল্পনা]

পরিপূর্ণ মিলনের মাঝখানেই বিচ্ছেদের কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। তাই থেমে থেমে একটি দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে কবিতাটি শেষ হয়েছে। জীবনানন্দও স্বীকার করেছেন : 'আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন। এ-স্বপ্ন যেখানে সত্য, জীবনানন্দ আমাদের সেই পরাবাস্তবতার জগতে নিয়ে গেছেন, যেখানকার আলো- অন্ধকারে হারানো সৌন্দর্যকে বারবার ফিরে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে যা অনুচ্চারিত হলেও লালিত্যের সঙ্গে আভাসিত। তেমনই রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির শেষ দীর্ঘনিশ্বাসে জীবনানন্দের কবিতাটির বাস্তব ও পরাবাস্তবের মাঝখানের পর্দাটি মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠেছে। এর পরেও জীবনানন্দ ট্রাডিশন বিচ্যুত অথবা তিনি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন পড়েননি, এমন সন্দেহ নিশ্চয়ই মনের মধ্যে জাগবে না। জীবনানন্দের জগৎ রবীন্দ্রনাথের জগৎ নয়, তা মনে রেখেই আমরা এ-কথা বলছি। যথার্থ নতুন কবিতা এভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঐতিহ্যকে অঙ্গীভূত করেই তা কাব্যের কাঠামোকে বদলে দেয়। জীবনানন্দ দাশও তা-ই করেছেন।

'বনলতা সেন' কবিতাটি পড়তে পড়তে পাঠকের Edger Allan Poe –এর 'To Helen' কবিতাটির কথাও মনে পড়ে স্বাভাবিক। 'To Helen' -এর প্রথম স্তবক 'বনলতা সেন'-এর প্রথম স্তবকের 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন' ও দ্বিতীয় স্তবকের হালভাঙা নাবিক ও দারুচিনী-দ্বীপের চিত্রকল্পটি মনে পড়িয়ে দেবে, যদিও দারুচিনি দ্বীপের ভেতর সবুজ ঘাসের দেশ ও 'Native Shore'-এর মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। জীবনানন্দের বক্তব্য অনুসারে 'Perfumed Sea' রসাভাস দোষ ঘটাবে, সবুজ ঘাসের দেশ-ই তাঁর কাছে 'Perfumed' (দারুচিনী-দ্বীপ)। 'To Helen'-এর দ্বিতীয় স্তবকের 'Thy hyacinth hair, thy, classic face'- এর সঙ্গে 'the glory that was Greece 'the grandeur that was Rome' যোগ করলে যে ফল পাওয়া যায়, তার তুলনায় 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য অনেক বেশি প্রভাবশালী, এ-কথা মেনে নিলেও সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করা দরকার। হেলেন পৌরাণিক চরিত্র, মালবিকা ও কালিদাসের কাব্যজগৎ থেকে হেঁকে তোলা প্রায় পৌরাণিক চরিত্র। তাদের মধ্যে ধ্রুপদী সৌন্দর্যের আবিষ্কার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না। কিন্তু নাটোরের বনলতা সেন কবির ও পাঠকের সমকালীন আধুনিক নারী। তার মধ্যে কবি যখন ধ্রুপদী সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন, তখন বিষয়ের যে অভূতপূর্ব আবেগের সৃষ্টি করে, তার স্বাদ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। সেই আবেগ ছন্দের মধ্যে বিশেষ করে প্রতি গুবকের শেষ পংক্তি দু'টির অন্ত্যমিলে যে, ভাবে ধরা পড়েছে তার কোনো প্রতিতুলনা পো-র কবিতায় পাওয়া যাবে না। তাছাড়া 'বনলতা সেন'-এ ওপরে আলোচিত চিত্রকল্প দুটি ছাড়া অন্যান্য যে সকল বিশিষ্ট চিত্রকল্পগুলি সমাবিষ্ট হয়েছে, পো-র কবিতার সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। 'বনলতা সেন'-এর ওপর 'স্বপ্ন' অথবা 'To Helen -এর প্রভাব অস্বীকার করার কথা যেমন ওঠে না, তেমনই সেই প্রভাবের ওপর অনাবশ্যক জোর দেয়াও আমাদের কাছে অর্থহীন ঠেকে। তবু এ-ধরনের আলোচনার প্রয়োজন আছে কেননা, কবিতার জন্মকাহিনী যে কত জটিল ও রহস্যময়, তা এ ধরনের আলোচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি; এবং এ-কথা আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় যে- "the mind of the mature poet differs from that of the immature one not precisely in any valuation of 'Personality. not being necessarily more interesting, or having 'more to say,' but rather by being a more finely perfected medium in which special, or very varied, feelings are at liberty to enter into new combinations."[২]

এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের কবি- মানস একটি শক্তিশালী পরিশীলিত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে গেছে, যেখানে নানা 'রকমের বিশিষ্ট ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার রাসায়নিক মিশ্রণে একটি মহৎ কবিতার জন্ম হয়েছে। জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় কেবলমাত্র হারানো প্রেমের শূন্যতাই ব্যঞ্জিত হয়েছে অথবা না পাওয়া প্রেমের আর্তি ও হাহাকার গুমরে গুমরে ফেটে পড়েছে—একথা সত্য নয়। পরিপূর্ণ প্রেমের প্রশান্তি সমস্ত অভাব বোধের ঊর্ধ্বে কবির হৃদয়কে ভরে রেখেছে সে-পরিচয়ও তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়-

"পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;

পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।" [সন্ধ্যা হয় - রূপসী বাংলা]

প্রকৃতি ও ইতিহাস-চেতনা কবিকে শক্তি জুগিয়েছে, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি শক্তি তিনি প্রেমের কাছ থেকেই পেয়েছেন-

"বয়স বেড়েছে ঢের নর-নারীদের;
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো;
তবুও সমুদ্র নীল; ঝিনুকের গায়ে আলপনা;
একটি পাখির গান কী রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।" [সুরঞ্জনা - বনলতা সেন]

আর সেই সাধনার ফল হলো-

"....সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তার এক মানুষীর গভীর হৃদয়।" [সুরঞ্জনা - বনলতা সেন]

বর্তমান নাস্তিক যুগে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি উজ্জ্বল বিশ্বাসকে হৃদয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি; বোধ হয় তার পুনরুজ্জীবনেরও কোনো আশা নেই। কিন্তু-

"যে জিনিস বেঁচে আছে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে :-
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।" [নির্জন স্বাক্ষর - ধূসর পাণ্ডুলিপি]

তার মৃত্যু নেই। মানবের জ্ঞান, ধর্ম অথবা সঙ্ঘ সকলের-ই পেছনে এ শক্তি আবহমান কাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। প্রেমহীন জ্ঞান, ধর্ম অথবা সঙ্ঘের শক্তি পৃথিবীতে বেশিদিন টিকে থাকে না, টিকে থাকলেও মানব সভ্যতার বিশেষ উন্নতি করতে পারে না। জ্ঞান, ধর্ম ও সঙ্ঘ প্রেমের শক্তিতে বলীয়ান। এ-প্রেম হয়তো মানবপ্রেম। কিন্তু মানবপ্রেমেরও মূলে 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'।

"তোমার সৌন্দর্য নারী, অতীতের দানের মতন।
মধ্য সাগরের কালো তরঙ্গের থেকে ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহবানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে ধর্মে নির্বাণে;
তোমার সুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।" [মিতভাষণ - বনলতা সেন]

কবি মানব সভ্যতার মর্মের ক্লান্তিকে অনুভব করেছেন। বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা তাঁর হৃদয়কেও ব্যথিত করে তুলেছে। তিনি চোখ মেলে দেখেছেন, কিভাবে ক্রমশ মানব সভ্যতা তার স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতাকে হারিয়ে ফেলেছে-

"তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুক্রবার হল, সূর্য মানে আলো;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।" [মিতভাষণ - বনলতা সেন]

তবুও এখনও ভরসা করতে পারা যায় বলে কবি বলতে পারেন-

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।" [সুচেতনা - বনলতা সেন]

নদীর স্নিগ্ধ শুশ্রূষা আর সূর্যের আলো দিয়ে নারীর যে-হৃদয় তৈরি, সেই হৃদয়ের-ই পথে চেতনার আলো জ্বেলে মানুষকে যাত্রা শুরু করতে হবে: 'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। পৃথিবীর মুক্তি যে সহজসাধ্য নয়, একথা তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে! সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।' ত প্রকৃতিলীন জীবনের মধ্যে প্রেম ও ইতিহাস-চেতনার আলো জ্বেলে অনেক অনেক দিন ক্লান্ত হয়েও ক্লান্তিহীন মনে বাতাসের মতো সূর্যকরোজ্জ্বল মানব-সমাজ গড়ে তোলার ভরসা রাখেন। কবির কাছে এ-ভরসার সঙ্গত কারণ বর্তমান-

"মাটি পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয় —
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।" [সুচেতনা - বনলতা সেন]

অথবা,

"অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়।
এই স্বাদ — গভীর গভীর।" [পাখিরা - ধূসর পাণ্ডুলিপি]

জীবনানন্দ বনলতা সেনের মুখে শ্রাবন্তীর কারুকার্য, স্কুলে অন্ধকার বিদিশার নিশা আর চোখে পাখির নীড়ের মতো শান্তির আশ্রয় আবিষ্কার করেছেন। শ্যামলীর মুখে দেখেছেন সেকালের শক্তি, যার অনুপ্রেরণায় যুবকেরা দ্রাক্ষা, দুধ ও ময়ূরশয্যার কথা ভুলে রূঢ় রৌদ্রে নতুন দেশের সোনার উদ্দেশে অকূলে জাহাজ ভাসাতো। প্রেমকে তিনি কত বিচিত্র, ব্যাপক ও গভীরভাবে অনুভব করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

"তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব-
শ্যামলী, করেছি অনুভব।" [শ্যামলী - বনলতা সেন]

উপমার দূরান্বয় সে দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, ওপরের উদ্ধৃতিটি আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপমা বলতে আমরা চিত্রকল্পগুলির কথা বোঝাতে চাইছি। কেননা, চিত্রকরও প্রসারিত উপমা ছাড়া আর কিছু নয়। শ্যামলীর মুখের দিকে তাকালে কবির যে-অনুভব জন্মে, বিভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমে (দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা, বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল, ঘর ছাড়া যুবাদের ক্রন্দন ইত্যাদি) সাদৃশ্য আবিষ্কারের দ্বারা তার পরিচয় দিতে চেয়েছেন। সেই অনুভবের বিষণ্ণ সৌন্দর্য উদাসকরা ঘর ছাড়া বেদনার অনির্বচনীয়তা নিয়ে আসে বলেই শ্যামলীর মুখ অনাস্বাদিত লাবণ্যে ভরে ওঠে। সেই মুখখানি জীবনের শূন্যতার মাঝখানে যৌবনের শ্যামলিমা বিছিয়ে দেয়, তাই নায়িকার নাম শ্যামলী।

"অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রেয়তর বেলাভূমি :
যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী সৌরভে।" [মিতভাষণ - বনলতা সেন]

জীবনানন্দ প্রেমের ক্ষেত্রে প্রায়-ই সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ করেন। তার মধ্যে আন্দোলন, আলোড়ন, বেদনা ও ক্ষয়-ক্ষতির ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়। কিন্তু সবার ওপরে থাকে একটি পরম প্রাপ্তির জন্য মানুষের দুর্জয় অন্বেষণের ইঙ্গিত। ফলে প্রেমের মুখের ওপর আবিষ্কারের আলো এসে পড়ে, তার সঙ্গে স্নিগ্ধ অনুভূতির সৌরভ মিশে যায় বলে তা আরো রমণীয় হয়ে ওঠে। প্রকৃতিলীন জীবন ও ইতিহাস-চেতনা কবিকে আশ্বাস দিলেও প্রেমের মতো তারা অমৃতের আস্বাদ নিয়ে আসে না, তাই প্রেম কবির কাছে 'শ্রেয়তর বেলাভূমি'।

"তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন;
তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কত পৌত্তলিক খ্রিস্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্য জাগার মতন;
কত কাছে তবু কত দূর।" [সবিতা - বনলতা সেন]

জীবনানন্দের নিজস্ব সমুদ্র-ব্যঞ্জনা ছাড়াও সমুদ্র থেকে পৃথিবী, ভেনাস ও উর্বশীর জন্মকাহিনীর অনুষঙ্গ পাঠকের মনে কাজ করে যায়। তাছাড়া অন্ধকারের বুক চিরে প্রথম উষার আবির্ভাব ও বৈদিক যুগের অনুষঙ্গ পাঠকের উপলব্ধিকে নিবিড়তর করে তোলে।

"সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।" [সুচেতনা - বনলতা সেন]

প্রেম দূরের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে বলে আজও মোহময়। 'বনলতা সেন' কবিতায় জীবনানন্দ পাঠকের চোখে প্রেমের যে মোহ-অঞ্জন এঁকে দিয়েছেন, তার কিছু আভা উদ্ধৃত পংক্তিগুলির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। সমুদ্রের মাঝখানে দূরতর দ্বীপ, বিকেলের কোলাহলের মধ্যে অস্ফুট নক্ষত্রের ঝিকিমিকি ও দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে নির্জনতা আমাদের অশান্ত ভিড়াক্রান্ত জীবনে নিভৃত প্রেমের রমণীয়তার আস্বাদ আনে। দারুচিনির সৌরভের সঙ্গে মিশে সে আহাদ সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

"একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।" [সুদর্শনা - বনলতা সেন]

Conclusion: জীবনানন্দের প্রেমে শারীরিকতা নেই, আধ্যাত্মিকতাও নেই। আছে এক অন্তহীন বোধ ও চেতনা, যাকে কবি অস্ত্রের মতো ব্যবহার করেছেন জীবনের সমস্ত বিষয়ের গ্রন্থিমোচনে। ফলে তাঁর প্রেমচেতনা আত্মকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে বিশ্বব্যাপ্ত হয়, তাঁর প্রেমের কবিতা কালজ্ঞান ও ইতিহাসচেতনায় হয় ধনী। জীবনানন্দ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও উত্তরব্যক্তিক। প্রেমের মতো অতি ব্যক্তিগত বিষয়েও জীবনানন্দ ব্যক্তিগত, আবার ব্যক্তি-উর্ধ্ব। এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। কবির সারাজীবনের অন্তর্গত দোলাচল শেষদিকে নারী ও প্রেম-ভাবনার একটি দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ সুশান্তিতে স্থিত হয়, জন্ম ও মৃত্যুর দুই কালো সাগরের ঢেউয়ের মধ্যবর্তী ক্ষণিক আলোকোজ্জ্বল মুহূর্তগুলিকে করে তোলে 'অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্য-সাগর'। বড় অর্থে প্রেমের উপলব্ধিতে তিনি শেষ পর্যন্ত আস্থা স্থাপন করেছিলেন, তার মধ্য দিয়েই শুনতে পেয়েছিলেন 'পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর'। মহিলা, যুগের সঞ্চিত পণ্য ও অগ্নিপরিধি পাঠককে কবির অভিজ্ঞতার অংশীদার করে তোলে। তবু যুগের ও দেহের দাবি মিটিয়েও আত্ম-ধিক্কারের প্রয়োজন হয় না। কেননা, দেবদারু গাছের উন্নত শীর্ষ, বাতাসে তার কিন্নর কণ্ঠ এবং ডালপালার ফাঁকে অমৃতসূর্যের আবির্ভাব সব গ্লানি মুছে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'সুদর্শনা'র অনুষঙ্গ বৈচিত্র্য ও নবীনতা এনেছে। প্রকৃতির মতো প্রেমেরও বিচিত্র অনুভূতির ঐশ্বর্যময় গভীরতায় জীবনানন্দ আধুনিক সকল কবিকেই অতিক্রম করে গেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন- "তীব্র আলো, স্পষ্ট বাক্য বা প্রখর রাগ রঞ্জন-এ সবের মধ্যে সে নেই। সে ধূসরতার কবি, চির প্রদোষ দেশের সে বাসিন্দা। যা সত্তা তাই তাঁর কাছে অবস্তু, আর যা অবস্তু তাই তাঁর অনুভূতিতে আশ্চর্য অস্তিত্বময়। যা অনুক্ত তাই অনির্বচনীয় আর যা শব্দ, স্পর্শ, স্পন্দ, তাই নীরব, নির্জন, নির্বাণ, নিশ্চল।"[৩]

Reference

(১) বসু, বুদ্ধদেব। (১৯৫৯)। জীবনানন্দ দাশ স্মরণে, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৩৯

(২) Eliot, T. S. (1957). The Sacred Wood, Butler & Tanner Ltd., p. 42

(৩) সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। (১৩৫৮)। কল্লোলযুগ, ডি এম লাইব্রেরি, পৃষ্ঠা- ১৭৩

Citation: **Singha. M.,** (2024) "জীবনানন্দের প্রেমচেতনা : আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন" *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-6, July-2024.